ভালো আছি ভালো থেকো
রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ

তপন বাগচী

ভালো আছি ভালো থেকো : রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ
তপন বাগচী

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২১

প্রকাশক
কবি প্রকাশনী
৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম বেইজমেন্ট
২৫৩-২৫৪ ড. কুদরত-ই-খুদা রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
সব্যসাচী হাজরা

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান পাবলিশার্স
১০/২ এ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট কলকাতা

মূল্য: ৩৫০ টাকা

Bhalo Achhi Bhalo Theko: Rudra Muhammad Shahidullah by Dr. Tapan Bagchi
Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market Kantabon Dhaka 1205 First Edition: March 2021
Cell: +88-01717217335 Phone: 02-9668736 (bkash) +88-01641863570
Price: 350 Taka RS: 350 US 15 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-94933-4-1

ঘরে বসে কবি প্রকাশনী'র যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

উৎসর্গ

রুদ্রভাতা কবি হিমেল বরকত

—আমারও অনুজ তুমি
পরে এসে আগে চলে গেলে—

ভূমিকা

রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর জীবনী-রচনা আমার গবেষক-জীবনের শুরুর দিকের কাজ। আমার গা থেকে ছাত্রত্বের গন্ধ ঘোচার আগে থেকেই আমি রুদ্রকে নিয়ে গবেষণা শুরু করেছিলাম। রুদ্রের অকালপ্রয়াণের পরে যত লেখা ছাপা হয়েছে, তার বেশিরভাগই ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ। আমি অবাক বিস্ময়ে লক্ষ করি যে, তাতে রুদ্রের সাহিত্য-মূল্যায়নের ঘাটতি রয়েছে। তখন আমার অনভিজ্ঞ কলমেই শুরু করি রুদ্রের কবিতা নিয়ে মূল্যায়নধর্মী প্রবন্ধ রচনার। সেই সময় *দৈনিক বাংলার বাণী*, *আজকের কাগজ* ও *বাংলাবাজার* পত্রিকায় আমার রুদ্র-সম্পর্কিত প্রবন্ধগুলো ছাপা হয়।

প্রতিবছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে *রুদ্রমেলা* হতো ঘটা করে। সেখানে অনেক খ্যাতিমান ব্যক্তি বক্তৃতা করতেন। কিন্তু রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ সৃষ্টি সংরক্ষণের উদ্যোগ দেখি না। পরে অবশ্য রুদ্রের *শ্রেষ্ঠ কবিতা*, *কবিতাসমগ্র* প্রকাশিত হয়েছে। একবার রুদ্রমেলায় বাংলা একাডেমির তৎকালীন মহাপরিচালক মনসুর মুসা বলেন, 'কেউ যদি রুদ্রর রচনাবলি কিংবা জীবনী প্রণয়ন করে জামা দেন, তবে বাংলা একাডেমি তা প্রকাশের উদ্যোগ নেবে'। তাঁর এই ঘোষণার প্রতি আস্থা রেখে পরের দিনই দেখা করে জীবনী প্রণয়নের আগ্রহের কথা জানাই। তিনি তেমন একটা সাড়া দিলেন না। আমি আশাহত হয়ে গবেষণা উপবিভাগের তৎকালীন উপপরিচালক ড. সুকুমার বিশ্বাসের কাছে একটি আবেদন জমা রেখে আসি। কিছুদিন পরে বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক পদে ব্রতী হন অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন। তিনি আমার প্রস্তাবে সম্মত হন। সুকুমারদা আমাকে ডেকে জীবনী প্রণয়নের আমন্ত্রণপত্র দেন। আর মুখে বলেন যে, দুই মাসের মধ্যে জমা দিতে পারলে ভাল হয়। আমি তখন একটি এনজিওতে কাজ করি। সেখান থেকে তো ছুটি পাওয়া সম্ভবপর নয়। তাই অফিস শেষে গভীর রাত পর্যন্ত কাজ করে রুদ্রের পরিবার থেকে তথ্য সংগ্রহ করি। এসময় রুদ্রের বোন বীথিকা শারমিন আর ভাই হিমেল বরকত আমাকে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করেন। অন্য ভাইবোনেরাও সহযোগিতা করতে কার্পণ্য করেনি। বিশেষ করে হিমেলের কথা বেশি মনে পড়ছে। কারণ তখন হিমেল উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণিতে ভর্তির জন্য গ্রাম থেকে শহরে এসেছে। তার হাতে তেমন কাজ ছিল না। তাই আমার সার্বক্ষণিক সহচর হয়ে ওঠে হিমেল। রুদ্রের ডায়েরি ঘাঁটতে ঘাঁটতে দেখেছি হিমেলকে চোখের জল মুছতে। রুদ্রের হাতেলেখা কবিতার খাতায় হিমেল হাত বোলাতো আর অশ্রুসজল হয়ে উঠত। রুদ্র বাংলায় পড়েছে বলে হিমেলও বাংলায় ভর্তি

হয় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে। ওখান থেকেই এমএ ও পিএইচডি করে। জাহাঙ্গীরগনর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিল হিমেল। আহা, সেই হিমেল আর নেই। রুদ্রের মতোই অকালপ্রয়াত!

হিমেলের সহযোগিতায় আমি রুদ্রের পারিবারিক তথ্য সংগ্রহ করি। এছাড়া রুদ্রবন্ধু কবি কামাল চৌধুরী, কবি রবীন্দ্রনাথ অধিকারী, সাংবাদিক জাফর ওয়াজেদ, কথাসাহিত্যিক ইসহাক খান, কবি নিশাত খান, কবি আলমগীর রেজা চৌধুরী, কবি শাহজাদী আঞ্জুমান আরা প্রমুখের সহযোগিতায় আমাকে কাজটি সম্পন্ন করতে পেরেছি। তবে সবচেয় বেশি সহযোগিতা পেয়েছি কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা ও কবি অসীম সাহার কাছ থেকে। রুদ্র এই দুই অগ্রজ কবির খুবই স্নেহধন্য ছিলেন।

আমার রুদ্রজীবনী প্রকাশে ড. সুকুমার বিশ্বাসে আগ্রহ ও উদ্যোগকেও আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। জীবনীর বাইরেও আমি রুদ্রর কবিতা বিশ্লেষণ করে *রুদ্র মহম্মদ শহিদুল্লাহ : চন্দ্রাহত অভিমান* নামে একটি গ্রন্থ রচনা করি। এই দুই গ্রন্থ মিলে *রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ : জীবন ও কবিতা* নামেও আমার একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই তিনটি গ্রন্থই বাজারে নেই। সেই ঘাটতি পূরণে এগিয়ে এল কবি প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী কবি-চলচ্চিত্রকার সজল আহমেদ। তার নিরন্তর তাগিদে রুদ্রজীবনীই নব কলেবরে প্রকাশিত হলো। তার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি না বরং আরো উপকৃত হওয়ার সুযোগ খুঁজছি।

আমি বইটির চমৎকার প্রচ্ছদের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই শিল্পী সব্যসাচী হাজরাকে। মুদ্রণে সহযোগিতার জন্য মোবারক হোসেনের প্রতিও রইল শুভ কামনা।

রুদ্রচর্চায় বেশ আগ্রহ রয়েছে বিভিন্ন মহলে। বেশ কিছু প্রবন্ধ এবং একটি প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণাও হয়েছে রুদ্রকে নিয়ে। আমি লক্ষ করেছি যে সেকল ক্ষেত্রে আমার সংগৃহীত তথ্য ব্যবহৃত হয়েছে কোনো প্রকার স্বীকৃতি ছাড়াই। বইটি বাজারে ছিল না বলে পাঠক তাঁদের চৌর্যবৃত্তি ধরার সুযোগ পেত না। এবার সেই সুযোগ রহিত হলো। পাঠকের জয় হোক।

তপন বাগচী
বাহাদুরপুর, মাদারীপুর

সূচিপত্র

জীবন-কথা ১১
জন্ম এবং বংশ পরিচয়
পরিবার পরিচিতি
শিক্ষা-জীবন
বিবাহ-সংসার-জীবন
কর্মজীবন
সাহিত্য জীবন
সাময়িকপত্র সম্পাদনা ৩৪
কতিপয় চরিত্র-বৈশিষ্ট্য ৪০
শেষজীবন ও মৃত্যু ৪৫
রচনাপঞ্জি পরিচিতি ৫৫
সাময়িকপত্রে প্রকাশিত রচনা ৭৩
সমকালীন প্রতিক্রিয়া ৮৯
জীবনদর্শন ও সাহিত্যবৈশিষ্ট্য ১১২
রচনা-নিদর্শন ১২৩
তথ্যনির্দেশ ১৯২
কৃতজ্ঞতা ১৯৫
আলোকচিত্র ১৯৭

জীবন-কথা

আমাদের মুক্তিযুদ্ধধন্য বাংলাদেশের গোটা সত্তর দশক জুড়েই ছিল সামাজিক ও রাজনৈতিক উত্থান-পতন, ধ্বংস-নির্মাণ, ত্যাগ-প্রাপ্তি এবং প্রত্যাশা–আশাভঙ্গের এক অনিবার্য অস্থিরতা। দেশের এই সংকটময়তার ছায়া পড়ে প্রতিটি শান্তিকামী বাঙালির প্রাত্যহিক জীবনক্রিয়ায়। উপর্যুপুরি রক্তপাত আর পরাজিত শক্তির উত্থানের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয় লেখক-শিল্পী-বুদ্ধিজীবীসহ সচেতন মহল। এই সময়ের সাহিত্য-পরিস্থিতি সম্পর্কে সব্যসাচী লেখক আবদুল মান্নান সৈয়দ লিখেছেন—

> সত্তরের দশকে অসম্ভব উল্লাস আর অসম্ভব হতাশা আশ্চর্য কূটাভাসে জড়িত-মিশ্রিত হয়ে আছে। বন্দী বাংলাদেশের মুক্তি ছিল উল্লাসের কেন্দ্রে আর হতাশার উৎস রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক আশাভঙ্গ। উল্লাসের একটি ফোয়ারা উচ্ছ্বসিত হয়েছে সৃষ্টিশীলতায়—প্রধানত কবিতায়—যে-কবিতা আমাদের আবেগের মুক্তির রাজপথ। তাই এই দশকে আমাদের সব দশকের কবিরাই নবীভূত হয়েছেন আর-একবার, আর-একবার নতুন রক্তে সঞ্জীবিত হয়েছেন। কিন্তু বিশেষ করে এ দশক সত্তরের নতুন কবিদেরই দখলে। আমি মনে করি না, তাঁরা অসাধরণ কাব্যিক সাফল্য অর্জন করেছেন। কিন্তু এই সময়ের জ্যোৎস্না-রৌদ্র, সময়ের দায়ভাগ, ভালোমন্দ, মূল্যবোধের দ্রুত পরিবর্তনের সব ক'টি স্বরগ্রাম বাদিত হয়েছে এঁদেরই কবিতায়।[১]

এই এঁদের মধ্যকার উল্লেখযোগ্য একজন, 'জাতির পতাকা খামচে ধরেছে সেই পুরনো শকুন' বলে যিনি দেশবাসীকে জাগিয়ে তোলার ব্রত কাঁধে তুলে নেন, তিনিই কবি রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ (১৯৫৬-১৯৯১)।

জন্ম এবং বংশ পরিচয়

রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর জন্ম ১৯৬৫ সালের ১৬ অক্টোবর বরিশাল রেডক্রস হাসপাতালে। রুদ্রের মেজমামির বাপের বাড়ি ছিল বরিশাল রেডক্রস হাসপাতালের সামনে। রুদ্রের মা বরিশালে ভাইয়ের শ্বশুরবাড়িতে অবস্থানকালে ঐ হাসপাতালে রুদ্র ভূমিষ্ঠ হন। রুদ্রের মায়ের নাম শিরিয়া বেগম, বাবার নাম শেখ ওয়ালীউল্লাহ। তাঁদের স্থায়ী নিবাস বাগেরহাট জেলার মংলা থানার অন্তর্গত সাহেবের মেঠ গ্রামে। শেখ ওয়ালীউল্লাহর জন্ম ১৯৩৩ সালের ১৬ নভেম্বর। পেশায় ছিলেন চিকিৎসক। ঢাকার স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি নিয়ে নিজ

এলাকায় ফিরে যান এবং মংলা ডক লেবার হাসপাতালে চিকিৎসক হিসাবে যোগ দেন। ১৯৯৬ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি তিনি স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেন। আমৃত্যু তিনি ডক লেবার হাসপাতালের চিকিৎসক হিসেবেই দায়িত্ব পালন করেন। রুদ্রের মা শিরিয়া বেগম মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শেষ ধাপ পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন। ঘরকন্নায় জড়িয়ে পড়ে আর এগনো হয়নি। রুদ্রের বাবা ছিলেন রুদ্রের মায়ের চেয়ে নয় বছরের বড়। সেই হিসেবে তাঁর জন্ম ১৯৪২ সালে।[২]

রুদ্রের পিতামহের নাম শেখ মুহম্মদ ইফসুফ। উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি তাঁর পিতা শেখ মঙ্গল হাজীর বিপুল পরিমাণ ভূসম্পত্তির মালিক হন। শেখ মঙ্গল হাজির পিতা ধোনাই খাঁ এই ভূসম্পত্তির অধিকারী হন দখল সূত্রে। এ প্রসঙ্গে কবি ও গবেষক রহিমা আখতার কল্পনা 'রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ : কবি পরিচিতি' শীর্ষক রচনায় উল্লেখ করেছেন—

> আনুমানিক উনবিংশ শতাব্দীর শুরুর সময়। ব্রিটিশ শাসনাধীন অবিভক্ত ভারতবর্ষের পূর্ববঙ্গ, বর্তমান বাংলাদেশ। খুলনা জেলার তৎকালীন বাগেরহাট মহকুমার রামপাল থানার বিশাল এলাকা সুন্দরবনের অন্তর্ভুক্ত। সেখানে জঙ্গল কেটে সদ্য বাসযোগ্য করে তুলেও গ্রামটিকে পুরো গ্রামই বলা যায় না। অত্যন্ত সাহসী পরিশ্রমী কিছু মানুষ সুন্দরবনের জঙ্গল কেটে জায়গাটিকে আবাদ ও বসবাসের যোগ্য করে তুলেছেন। এ সময় যশোর থেকে খুলনার বাগেরহাটে পির খান জাহান আলীর মাজারে প্রায়ই আসতেন তাঁর মুরিদ ধোনাই খাঁ। একসময় তিনি সাহেবের মেঠ-এ বসতি স্থাপন করেন, জঙ্গল কেটে জমি আবাদযোগ্য করতে শুরু করেন এবং প্রথামতো তাঁর প্রস্তুত করা আবাদযোগ্য জমির মালিক হন। ক্রমে তিনি বিশাল এলাকার অধিকারী হয়ে ভূস্বামী বলে পরিচিত হন।[৩]

রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ এক ধনাঢ্য পরিবারের সন্তান। সম্ভ্রান্ত শেখ পরিবার এখনো বাগেরহাট জেলার মধ্যে অত্যন্ত প্রতাপশালী ও প্রভাবশালী হিসেবে পরিচিত। এদের আদি নিবাস যশোর জেলায়। বাগেরহাটের মংলা অঞ্চলে এরাই প্রথম পত্তনী গড়ে। মংলা অঞ্চলের সেই ঝোপ-জঙ্গল এখন আগের মতো নেই। দেশের অন্যতম সমুদ্রবন্দর হিসেবে এখন যোগাযোগ ব্যবস্থার দিক দিয়েও যথেষ্ট উন্নত। বাগেরহাট জেলা-সদর থেকে মংলা থানার দূরত্ব ৫১ কিলোমিটার। মংলা শুধু থানাই নয়, এটি এখন পৌরসভায় উন্নীত। মংলা থেকে ৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লার গ্রামের বাড়ি সাহেবের মেঠ। এটি মিঠেখালি ইউনিয়নের অন্তর্গত। সাহেবের মেঠ একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। এই গ্রামে একটি উচ্চবিদ্যালয় ও তিনটি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। রুদ্রর মৃত্যুর পরে ১৯৯২ সালে এলাকাবাসীর উদ্যোগে মিঠেখালি গ্রামে নতুন যে প্রাথমিক বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়েছে তার নাম রাখা হয়েছে 'রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যাপীঠ'।

পরিবার পরিচিতি

সাহেবের মেঠের শেখ পরিবারের খ্যাতি রয়েছে এলাকা জুড়ে। বিশেষত রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে অনেক খ্যাতিমান ব্যক্তি রয়েছেন। শেখ খান জাহান আলীর মুরিদ হিসেবে রুদ্রের দাদুর দাদু ধোনাই খাঁ এবং তাঁর পুত্র শেখ মঙ্গল হাজী এলাকায় বিখ্যাত। তাঁর পুত্র শেখ মুহম্মদ ইফসুফকে অঢেল সম্পত্তির মালিক হিসেবে এলাকার সকলে এক নামে চেনে। তাঁর পুত্র অর্থাৎ রুদ্রের পিতা শেখ ওয়ালীউল্লাহ একজন চিকিৎসক হিসেবে জনপ্রিয় ছিলেন। শেখ ওয়ালীউল্লাহর পিতার দুই বিয়ে। তিনি প্রথম পক্ষের সন্তান। প্রথম পক্ষে তিন ভাই ও এক বোন। রুদ্রের বড় কাকার নাম শেখ নুর মুহম্মদ। প্রথম পক্ষের মেজ কাকা (ক্রমানুসারে পঞ্চম) শেখ আব্দুল জলিল রুদ্রের কাকাদের মধ্যে একমাত্র জীবিত ব্যক্তি। রুদ্রের বাবা ছিলেন ভাইবোনদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ। রুদ্রের একমাত্র ফুপুর নাম জোবেদা খাতুন। পরবর্তীকালে এই ফুপুর সঙ্গে রুদ্রের বড়মামা শেখ আবু বকর সিদ্দিকের বিয়ে হয়। সে-হিসেবে রুদ্রের ফুপুই তাঁর বড় মামি। শেষ পক্ষের তিন কাকা হচ্ছেন শেখ আহম্মদ আলী, শেখ আবুল হাসেম এবং শেখ হাবিবুর রহমান। রুদ্রের সেজকাকার মেজ ছেলে সাব্বির হাসান একজন চিকিৎসক। এমবিবিএস পাস করে এখন আমেরিকা-প্রবাসী।

রুদ্রের নানা শেখ মুহম্মদ ইসমাইল ছিলেন মংলা এলাকার অন্যতম বিখ্যাত ব্যক্তি। তিনি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান এবং পরবর্তীকালে গভর্নর ছিলেন। শেষদিকে মিঠেখালি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। বয়সের ভারে এই দায়িত্ব পালনে করতে অসুবিধা হলে তাঁর বড় ছেলে অর্থাৎ রুদ্রের বড়মামা আলহাজ শেখ আবু বকর সিদ্দিক ঐ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নির্বাচনে প্রার্থী হন এবং জয়লাভ করেন। তিনি একাধিকবার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার গৌরব লাভ করেন। এলাকায় শিক্ষাবিস্তারেও তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। রামপাল ও মংলা এলাকার বেশ কয়েকটি স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান এলাকাবাসী শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে। এই বড়মামাই রুদ্রের একমাত্র ফুপা। শেখ আবু বকর সিদ্দিক ছাড়াও রুদ্রের নানার চারটি ছেলে এবং তিনটি মেয়ে। অর্থাৎ পাঁচ মামা এবং তিন খালা। দুই মামা এবং দুই খালা শৈশবেই মৃত্যুবরণ করেন। রুদ্রের মেজমামা শেখ আবু তাহের নাট্যামোদী ছিলেন। জানা যায়, তিনি কলকাতার একটি চলচ্চিত্রে অভিনয়ও করেছিলেন। চলচ্চিত্রের নামটি জানা যায় নি।[৪] এই মামার ছেলে আবু জগলুল মঞ্জু রুদ্র-প্রতিষ্ঠিত 'অন্তর বাজাও' সংগীত সংগঠনের অন্যতম শিল্পী। রুদ্রের সেজমামা আলহাজ্ব শেখ তৈয়বুর রহমান ১৯৫৪ সালে রামপাল-দাকোপ-বটিয়াঘাটা এলাকায় যুক্তফ্রন্টের মনোনয়নে এমএলএ নির্বাচিত হয়েছিলেন। সেজমামার ছেলে মাহমুদ হাসান (মণি) মিঠেখালি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ছিলেন। এঁর সঙ্গে রুদ্রের বোন বীথিকা শারমিনের বিয়ে হয়। রুদ্রের ছোটমামার নাম শেখ আজিজুর রহমান।

রুদ্রের মায়ের দাদার মামা বাসের শাহ্-ও ছিলেন এলাকার নামজাদা 'পির'। রুদ্রের বাবা ডা. শেখ ওয়ালীউল্লাহ নিজের শ্বশুরের নামানুসারে নিজ গ্রামে প্রতিষ্ঠা করেছেন 'ইসমাঈল মেমোরিয়াল হাইস্কুল'। আমৃত্যু তিনি ঐ স্কুলের ব্যবস্থাপনা পরিষদের চেয়ারম্যান ছিলেন।

রুদ্ররা দশ ভাইবোন। রুদ্রই সকলের বড়। দ্বিতীয় বীথিকা শারমিন উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত পড়ালেখা করে এখন গৃহিণী। বীথিকা শারমিন নামটি রুদ্রের দেওয়া। তাঁর অন্য নাম শরিফুন হাসান। তৃতীয় ডাক্তার মুহম্মদ সাইফুল্লাহ চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস পাস করে চিকিৎসা পেশায় নিয়োজিত। তাঁর স্ত্রী নীলুফার ইয়াসমীন ময়মনসিংহ মেডিকের কলেজ থেকে এমবিবিএস পাস করে চিকিৎসাকেই পেশা হিসাবে নিয়েছেন। চতুর্থ সোফিয়া শারমিন (সাফি) উচ্চমাধ্যমিক পাস করে গৃহিণী। তাঁর স্বামী গাজী আহসান হাবীব বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থায় কর্মরত। পঞ্চম মেরী শারমিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এমএ পাস করে গৃহিণী। তাঁর স্বামী শরিফুল ইসলাম বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একজন কর্মকর্তা। ষষ্ঠ আবীর আব্দুল্লাহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যবস্থাপনা বিষয়ে এম.কম পাস করে 'দৃক আলোকচিত্র গ্যালারি'তে কর্মরত। সপ্তম সুবীর ওবায়েদ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মেরিন সায়েন্সে এম.এসসি পাস করেছেন। তাঁর স্ত্রী ফওজিয়া খানমও একই বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এসসি। অষ্টম ইরা শারমিন বিএ পাস করেছেন। নবম সুমেল সরাফাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাইন্যান্স বিভাগের এমকম। দশম হিমেল বরকত জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে স্নাতকোত্তর ও পিএইচ.ডি। এখন ওই বিভাগে অধ্যাপনা করতেন। ভাইবোনদের মধ্যে আবীর আবদুল্লাহ এবং হিমেল বরকত লেখালেখি করেন। আবীর আবদুল্লাহ ভালো ছড়াকার এবং দক্ষ আলোকচিত্রশিল্পী হিসেবে পরিচিত। হিমেল বরকত লেখা বেশ কিছু গান 'অন্তর বাজাও' সংগঠনের শিল্পীরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পরিবেশন করে। হিমেল বরকত ২০২০ সালের ২২ নভেম্বর মৃত্যুবরণ করেন।

রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর পিতৃপ্রদত্ত নাম হচ্ছে মোহম্মদ শহীদুল্লাহ। ছোটবেলায় এই নামেই তিনি পরিচিত ছিলেন। কিন্তু লেখালেখি করতে এসে এই নামটি তাঁর পছন্দ হয় নি। পিতৃপ্রদত্ত নামটি তিনি বদলে ফেলেন। নামের শুরুতে 'রুদ্র' শব্দটি যোগ করা ছাড়াও 'মোহম্মদ'-কে মুহম্মদ এবং 'শহীদুল্লাহ'-কে 'শহিদুল্লাহ' করেছেন। লেখক নাম হিসেবেই তিনি এই নাম গ্রহণ করেছেন, তা নয়। প্রকৃত নাম হিসেবে পরীক্ষার সনদপত্রেও এই নাম ব্যবহার করেছেন।

শিক্ষা-জীবন

রুদ্রের নিজ বাড়ি সাহেবের মেঠ থেকে নানাবাড়ি মিঠেখালি খুব বেশি দূরে নয়। মিঠেখালি ইউনিয়নেই এই দুটি গ্রামের অবস্থান। ছোটবেলার অধিকাংশ সময় রুদ্র

তাঁর নানাবাড়িতে কাটাতেন। নানাবাড়ির পাঠশালাতেই তাঁর লেখাপড়ার হাতেখড়ি। এমনকি লেখালেখির আগ্রহ তৈরি হয় ঐ নানা বাড়ি থেকে। নানাবাড়িতে ঐ সময় ঢাকার 'বেগম' আর কলকাতার 'শিশুভারতী' আসত নিয়মিত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর কাজী নজরুল ইসলামের বইপত্র তো ছিলই। পাঠশালার পাঠ ডিঙানোর পর ১৯৬৪ সালে রুদ্র দ্বিতীয় শ্রেণিতে ভর্তি হন নানার নামে প্রতিষ্ঠিত 'ইসমাঈল মেমোরিয়াল স্কুল'-এ। এখনো পর্যন্ত স্কুলটি বাগেরহাট অঞ্চলের বিখ্যাত স্কুল হিসাবে পরিচিত। রুদ্রের বয়স তখন আট বছর। এ-সময় স্কুলে পড়ালেখার পাশাপাশি রুদ্র বিভিন্ন পত্রপত্রিকা এবং রবীন্দ্র-নজরুলের বই পড়ার সুযোগ পান। এঁদের অনেক কবিতা শিশু রুদ্রের মুখস্থ ছিল। নানাবাড়িতে রুদ্র তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা করেন। এরপর ১৯৬৬ সালে মংলা থানা সদরে সেন্ট পলস স্কুলে চতুর্থ শ্রেণিতে ভর্তি হন। এই স্কুলে পাঁচ বছর পড়াশোনা করে তিনি ১৯৭০ সালে অষ্টম শ্রেণি থেকে নবম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হন। ১৯৭১-র মার্চ মাসে শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। রুদ্রের আর নবম শ্রেণিতে পড়া হয় নি।

যুদ্ধে বিজয়ের পর ১৯৭২ সালে নবম শ্রেণি টপকিয়ে রুদ্র ঢাকার ওয়েস্ট এন্ড হাইস্কুলে দশম শ্রেণিতে ভর্তি হন। থাকতেন ৫০ লালবাগে মামার বাসায়। এই স্কুলে থেকেই তিনি ১৯৭৩ সালে ৪টি বিষয়ে লেটার মার্কসসহ বিজ্ঞান শাখায় প্রথম বিভাগে এসএসসি পাস করেন। ভর্তি হন ঢাকা কলেজে। পিতামাতার প্রবল ইচ্ছে স্বত্ত্বেও রুদ্র বিজ্ঞান শাখায় পড়ে ডাক্তার হওয়ার পথে যাননি। তিনি নিজের পছন্দে মানবিক শাখায় চলে যান। ঢাকা কলেজে এসে রুদ্র পুরোপুরি সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করেন। এ সময়ে তিনি সহপাঠী হিসাবে পান কামাল চৌধুরী, আলী রীয়াজ, জাফর ওয়াজেদ, ইসহাক খানসহ একঝাঁক তরুণ সাহিত্যকর্মীকে। কামাল চৌধুরী কবি ও সিনিয়র সচিব, আলী রীয়াজ প্রাবন্ধিক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ইসহাক খান কথাসাহিত্যিক এবং জাফর ওয়াজেদ কবি-সাংবাদিক ও বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক। ঢাকা কলেজ থেকেই রুদ্র ১৯৭৫ সালে উচ্চমাধ্যমিক পাস করেন দ্বিতীয় বিভাগে। দু'বছরে রুদ্র ক্লাস করেছিলেন মাত্র আঠারটি। নির্বাচনী পরীক্ষা দিতেও সমস্যা হয়েছিল। এরপর ভর্তি হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের বিএ (অনার্স) শ্রেণিতে। বন্ধু জাফর ওয়াজেদও একই বিভাগে ভর্তি হন। এ সময় আরো যাঁরা তাঁর লেখক বন্ধু ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম কামাল চৌধুরী, রেজা সেলিম, ইসহাক খান, মঈনুল আহসান সাবের, সুব্রত শংকর ধর, সলিমুল্লাহ খান, তুষার দাশ, বিশ্বজিৎ ঘোষ, রফিকউল্লাহ খান, ভীষ্মদেব চৌধুরী, আলমগীর রেজা চৌধুরী, সাজেদুল আউয়াল, মোহন রায়হান, রবীন্দ্রনাথ অধিকারী, নিশাত খান, শাহজাদী আঞ্জুমান আরা মুক্তি প্রমুখ। এ সময় রুদ্র থাকতেন ২১ সিদ্ধেশ্বরীতে, বন্ধু বদরুল হুদা সেলিমের বাসায়।

১৯৭৮ সালে রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ ডাকসু নির্বাচনে অংশ নেন বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের মনোনয়নে সাহিত্য-সম্পাদক পদে। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন কামাল

চৌধুরী (ছাত্রলীগ) এবং আলী রীয়াজ (জাসদ-ছাত্রলীগ)। বন্ধু জাফর ওয়াজেদও ডাকসুতে সদস্য পদে প্রার্থী হয়ে জয়লাভ করেন। আর সেবার সাহিত্য সম্পাদক নির্বাচিত হন আলী রীয়াজ। রুদ্র সরাসরি ছাত্র রাজনীতির নেতৃত্বে না এলেও নির্বাচনে অংশ নেয়ার মধ্যে দিয়ে নিজের রাজনৈতিক বিশ্বাসকে প্রকাশ করেন। তাঁর এই বিশ্বাস জীবনের শেষদিন পর্যন্ত টিকে ছিল।

রুদ্র আবাসিক ছাত্র ছিলেন সলিমুল্লাহ হলের। কিন্তু যতদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে থাকতেন, তার অধিকাংশই কাটাতেন ফজলুল হক হলের কামাল চৌধুরীর ৩০৯ নম্বর কক্ষে অথবা রেজা সেলিমের ১১০ নম্বর কক্ষে। ১৯৭৯ সালে রুদ্রের অনার্স পরীক্ষা দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ক্লাসে উপস্থিতির হার কম থাকায় অনেক অনুরোধেও বাংলা বিভাগের তৎকালীন চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডক্টর আহমদ শরীফ রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ ও জাফর ওয়াজেদকে পরীক্ষা দিতে অনুমতি দেন নি।[৫] পরের বছর ১৯৮০ সালে এঁরা বিএ (অনার্স) ডিগ্রি লাভ করেন দ্বিতীয় শ্রেণি পেয়ে। এ সময় রেজা সেলিমও তাঁদের সাথে পরীক্ষা দেন।[৬] এরপর নানান রাজনৈতিক, সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ায় রুদ্রের প্রাতিষ্ঠানিক পড়ালেখা আবারও পিছিয়ে পড়ে। অবশেষে ১৯৮৩ সালে এমএ ডিগ্রি লাভ করেন। ছাত্রজীবনেই রুদ্রের দুটি কবিতাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। প্রথম গ্রন্থের প্রকাশক ছিলেন বুক সোসাইটির পক্ষে বিশিষ্ট সাহিত্যিক আহমদ ছফা। বইটি প্রকাশের সময় সম্পর্কে রুদ্রের বন্ধু রেজা সেলিম জানিয়েছেন–

> রুদ্রের প্রথম কবিতার বই 'উপদ্রুত উপকূল' ফেব্রুয়ারি উনাশি সালে। আমার খুব মনে আছে, সে সময়টায় ওর অস্থিরতাগুলোর কথা। ইতিমধ্যে আমাদের সব ব্যবধান ঘুচে আমরা হয়ে উঠেছিলাম সময়ের খুব কাছাকাছি। একই সাথে বেরিয়েছিল মোহনের 'জ্বলে উঠি সাহসী মানুষ' এবং রীয়াজের আলোড়ন সৃষ্টিকারী প্রবন্ধের বই 'বাঙালী জাতীয়তাবাদ'। এই বই তিনটি এবং সেই সময়টি আমাদের সবচে' উজ্জ্বল এবং গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।[৭]

ছাত্রাবস্থায় রুদ্রের দ্বিতীয় যে-বইটি প্রকাশিত হয় তার নাম 'ফিরে চাই স্বর্নগ্রাম'। প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৮১ সালে। এই দুটি গ্রন্থের জন্য ছাত্রাবস্থায়ই তিনি সংস্কৃতি সংসদ প্রবর্তিত 'মুনীর চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার' লাভ করেন যথাক্রমে ১৯৮০ ও ১৯৮১ সালে।[৮] এরকম কৃতিত্বের মধ্যে দিয়েই অতিবাহিত হয়েছে রুদ্রের শিক্ষাজীবন।

রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ ছাত্র হিসেবে সংযুক্ত ছিলেন সলিমুল্লাহ হলে। কিন্তু এই হলে কোনদিন থাকেন নি। তাঁর কলেজ জীবন কাটে ৫০ লালবাগের মামাবাড়িতে। আর বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে কোনো হলেরই আবাসিক ছাত্র ছিলেন না। কিছুদিন থেকেছেন কবি মুহম্মদ নুরুল হুদার সঙ্গে ১১/১ উত্তর বাসাবো ভাড়াবাড়িতে। ওখান থেকে এসে ওঠেন বন্ধু বদরুল হুদা সেলিমের ২১ সিদ্ধেশ্বরীর বাড়িতে। এ সময় বন্ধু আলী রীয়াজের বাড়ি ২৩ সিদ্ধেশ্বরীতেও কিছু দিন থেকেছেন।

বিবাহ-সংসার-জীবন

রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ ২৯/১/১৯৮১ তারিখে বিয়ে-বন্ধনে আবদ্ধ হন। এ বিয়েতে কোন আনুষ্ঠানিকতা ছিল না। স্ত্রীর নাম লীমা নাসরিন। পরবর্তীকালে তসলিমা নাসরিন নামে লেখালেখি করেন। লেখালেখির কারণে তিনি আলোচিত ও জনপ্রিয় হন। এক পর্যায়ে তিনি বিতর্কিত হয়ে পড়েন। প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষেপে উঠলে দেশ ছেড়ে তিনি আত্মনির্বাসিত। তসলিমা নাসরিন 'নির্বাচিত কলাম' গ্রন্থের জন্যে পশ্চিমবঙ্গের আনন্দ পুরস্কার লাভ করেন। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থ হচ্ছে শিকড়ে বিপুল ক্ষুধা, অতলে অন্তরীণ, লজ্জা, শোধ, আমার মেয়েবেলা, নির্বাসিত নারীর কবিতা প্রভৃতি। 'লজ্জা' উপন্যাসটি সরকার নিষিদ্ধ করেছে। তসলিমার মূল পেশা ছিল চিকিৎসা। তিনি ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি নিয়ে স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ও মিটফোর্ড হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার হিসাবে কাজ করতেন। তাঁর পিতা ডাক্তার রজব আলী, ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগের সার্জন।

রুদ্র ও তসলিমার পরিচয় লেখলেখির সূত্র থেকে। পরিচয় রূপ নেয় প্রেমে। এ সময় তাঁদের সঙ্গী ছিলেন কবি আলমগীর রেজা চৌধুরী। কবি রুদ্র তখন মোটামুটি পরিচিত। নাসরিনও মেডিকেল কলেজ ক্যাম্পাস-কেন্দ্রিক সাহিত্যচর্চায় অগ্রণী, ছাত্রছাত্রী সংসদের নির্বাচিত সদস্য (সাহিত্য বিভাগ)। সম্পাদনা করতেন 'সেঁজুতি' নামের অনিয়মিত সাহিত্যপত্র। তাঁদের প্রণয় ও পরিণয় সম্পর্কে রুদ্রের কবিবন্ধু আলমগীর রেজা চৌধুরী লিখেছেন,

> আমার প্রিয় শহর ময়মনসিংহের বাসার দু'গলি পর রুদ্রের প্রেমিকা, পরবর্তীকালে স্ত্রী, তসলিমা নাসরিনের বাসা। তসলিমার বড় ভাই রেজাউল করিম কামাল আমার পরিচিতজন। সেই সূত্রে নাসরিনের সাথে পরিচয়। নাসরিন কবিতা ভালোবাসতো। মেডিকেলশাস্ত্রে পড়তো, কাব্যপ্রেম হিসেবে 'সেঁজুতি' নামে একটি অনিয়মিত কবিতাপত্র বের করতো। নাসরিন প্রথম রুদ্র সম্পর্কে খোঁজখবর নেয়। আমি তার কেমন বন্ধু ইত্যাদি ইত্যাদি।
>
> ঠিকানা দিয়েছিলাম রুদ্রকে লেখার জন্যে। এভাবে নাসরিনের যোগাযোগ। রুদ্রের সঙ্গে নাসরিনের প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে আমার বোনের বাসায় ২৮ কালীশংকর গুহ রোডে। তার দু'বছর পর ওরা বিয়ে করে প্রচলিত বিয়ে ভেঙে একা এক। সাক্ষী শুধু কবি নির্মলেন্দু গুণ, নাট্যশিল্পী শাহাদত হোসেন হীলু, কবি মাসুদ বিবাগী আর আমি। তারও অনেকদিন পরে ওরা ঘর ঘর খেলা শুরু করলো রাজারবাগের এক বাসায়। নাসরিন ডাক্তারি পাস করে রুদ্রের ঘরে। আমি জীবিকার কারণে টাঙ্গাইলে। তারপরও ওদের দুজনার সঙ্গে অনেক দিনরাত্রির স্মৃতি আছে, যা মধুর। ওদের বিবাহ উৎসব বড্ড চমৎকার বেজিং চিনে রেঁস্তোরায়। এ-দেশের অধিকাংশ কবি সাহিত্যিক উপস্থিত ছিলেন। আসলে রুদ্র জীবনের বর্ণাঢ্যতা পছন্দ করতো।[৯]

রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ বিয়ে করেছিলেন অভিভাবকের অমতে। তাঁর পিতার সঙ্গে মানসিক দুরত্ব ছিল। এ অবস্থায় সামাজিক প্রথার বাইরে গিয়ে বিয়ে করায় তাঁর

পিতা হয়তো কষ্ট পেয়েছিলেন। তবে ভাইবোনেরা এ বিয়ে মেনে নিয়েছিলেন সানন্দে। রুদ্র তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, তসলিমাও পাস করে বেরোন নি। তসলিমার পরিবারও এ বিয়ে মেনে নিতে পারে নি। ডাক্তারি পাস করার পরে তসলিমা তাঁর পরিবারের বন্ধন ছিঁড়ে রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর সঙ্গে ঢাকায় চলে আসেন। তাঁরা মোহম্মদপুরে বাসা নিয়ে দাম্পত্য জীবন শুরু করেন। বিয়ের প্রায় আড়াই বছর পরে রুদ্র সস্ত্রীক বাগেরহাটে গ্রামের বাড়ি যান। অনিচ্ছা সত্ত্বেও রুদ্রের বাবা তাঁদেরকে গ্রহণ করেন। ঢাকায় ফিরে রুদ্র তাঁর বাবাকে একটি চিঠি লেখেন। এই চিঠিতে পিতা পুত্রের আদর্শিক দূরত্বের কথা প্রকাশিত হয়েছে। পিতামাতার মতের বাইরে গিয়ে রুদ্রের এভাবে বিয়ে করার যৌক্তিক ব্যাখ্যাটাও চিঠিতে প্রকাশিত হয়েছে।

১৮.৬.৮৩
মুহম্মদপুর

আব্বা,

পথে কোনো অসুবিধে হয় নি। নাসরিনকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে গত পরশু ঢাকা ফিরেছি। আপনাদের মতামত এবং কোনোরকম আনুষ্ঠানিকতা ছাড়া আমি বিয়ে কোরে বউ নিয়ে বাড়ি যাওয়াতে আপনারা কষ্ট পেয়েছেন। কিন্তু আমিতো আমার জীবন এভাবেই ভেবেছি। আপনার সাথে আমার যে ভুল বোঝাবুঝিগুলো তা কক্ষনোই চ্যালেঞ্জ বা পিতা পুত্রের দ্বন্দ্ব নয়। স্পষ্টতই তা দুটি বিশ্বাসের দ্বন্দ্ব। ব্যক্তি আপনাকে আমি কখনোই ভুল বুঝি নি। আমি জানি না, আপনারা আমাকে কিভাবে বোঝেন।

এতো চরম সত্য কথা যে, একটি জেনারেশনের সাথে তার পরবর্তী জেনারেশনের অমিল এবং দ্বন্দ্ব থাকবেই। যেমন আপনার আব্বার সাথে ছিলো আপনার। আপনার সাথে আমার এবং পরবর্তীতে আমার সাথে আমার সন্তানের। এই দ্বন্দ্ব ও সংঘাত কোনোভাবেই রোধ করা সম্ভব নয়। আমরা শুধু এই সংঘাতকে যুক্তিসংগত কোরতে পারি। অথবা পারি কিছুটা মসৃণ কোরতে। সংঘাত রোধ করতে পারি না। পারলে ভালো হতো কিনা জানি না তবে মানুষের জীবনের বিকাশ থেমে যেতো পৃথিবীতে।

আমার মনে পড়ে না, আমার এই ছাব্বিশ বছরে– একদিনও আপনি পিতা হিসাবে আপনার সন্তানকে আদোর কোরে কাছে টেনে নেন নি। আশেপাশের অন্য বাবাদের তাদের সন্তানদের জন্যে আদোর দেখে নিজেকে ভাগ্যহীন মনে হয়েছে। কিন্তু এ নিয়ে কখনো কষ্ট প্রকাশ করি নি।

ছোটবেলায় আমার খেলতে ভালোলাগতো, খেললে আমি ভালো খেলোয়াড় হতাম। আপনি খেলতে দিতেন না। ভাবতাম, না খেল্লেই বোধহয় খুব ভালো, ভালো মানুষেরা বোধ হয় খেলে না। আবার প্রশ্ন জাগত, তা'হলে আমার খেলতে ভালো লাগে কেন? আমি কি তবে খারাপ মানুষ! আজ বুঝি, খেলা না-খেলার মধ্যে মানুষের ভালোমন্দ নিহিত নয়– কষ্ট লাগে!

আমিও স্বপ্ন দেখতাম আমি ডাক্তার হবো। আপনার চেয়ে বড় ডাক্তার হয়ে আপনাকে ও নিজেকে গৌরব দেবো। সন্তান বড় হলে পিতারই তো সুখ। আমি সেভাবে তৈরিও হচ্ছিলাম। কিন্তু স্বাধীনতাযুদ্ধের পর কী যে এক বিরাট পরিবর্তন এলো। একটি দেশ, একটি নোতুন দেশের জন্ম হলো। নোতুন চিন্তার সব কথা হতে লাগলো। নোতুন স্বপ্ন এলো মানুষের মনে। সবাই অন্যরকম ভাবতে শুরু করলো। আমিও আর আমার আগের স্বপ্নকে ধরে রাখাতে পারিনি। তার'চে বেগবান একস্বপ্ন আমাকে টেনে নিলো।

আমি সিরিয়াসলি লিখতে শুরু করলাম। আগেও একটু আধটু লিখতাম, এবার পুরোপুরি।

আমি আমার আগের সব চিন্তা ভাবনার প্রভাব ঝেড়ে ফেলতে লাগলাম নিজের চিন্তা থেকে, জীবন থেকে, বিশ্বাস থেকে, আদর্শ থেকে। অনেক কিছুর সঙ্গে সংঘর্ষ লাগতে লাগলো। অনেক কিছুর সাথে ভুল বোঝাবুঝি শুরু হলো। কখনো ক্ষোভে আমি অপ্রত্যাশিত কিছু করে ফেলতে লাগলাম। আবার আমার বিশ্বাসের সাথে মিল, এমন অনেক মানুষের দেখা পেলাম। তাদের সাথেও সংঘাত হলো। একি, সবার সাথেই সংঘর্ষ হয় কেন? মনে মনে আমি ভীষণ অস্থির হয়ে পড়লাম। তা'হলে কি এ-পথ ভুলপথ? আমি কি ভুলপথে চলেছি? কখনো মনে হয়েছে আমিই ঠিক, এই-ই প্রকৃত পথ। মানুষ যদি নিজেকে ভালোবাসতে পারে তবেই সে সব'চে সুন্দর হবে। নিজেকে ভালোবাসতে গেলেই সে তার পরিবারকে ভালোবাসবে। আর পরিবারকে ভালোবাসলেই সে একটি গ্রামকে ভালোবাসবে, এক গোষ্ঠির মানুষকে ভালোবাসবে। আর একটা গ্রাম মানেই তো সারা পৃথিবী। পৃথিবীর সব মানুষ সুন্দর হয়ে বাঁচবে।

আমি আমার বিশ্বাসে স্থির হয়েছি। আমি আমার নিজের কথা সব ক্ষেত্রে বুঝিয়ে বলবো, যতভাবে সম্ভব। না বুঝতে চাইলে বোঝাবো কিন্তু বুঝে না বোঝার ভান কোরলে তাকে চিহ্নিত ক'রে দেয়া এবং পরমুহূর্ত থেকেই তার সাথে সংঘাতে যাওয়া। কারণ সত্যতো একটা। একটা সত্য। যে কোনো একটি মুহূর্তেও জন্য মাত্র একটি মুহূর্তই নির্ধারিত। একটি মুহূর্তই সত্য। পৃথিবীতে কতো বড় বড় কাজ করছে মানুষ– একটা ছোট পরিবারকে সুন্দর করা যাবে না! অবশ্যই যাবে। একটু যৌক্তিক হলে, একটু খোলামেলা হলে কতো সমস্যা এমনিতেই মিটে যাবে। সম্পর্ক সহজ হলে, কাজও সহজ হয়। আমরা চাইলেই তা করতে পারি। জানি না, এই চিঠিখানা আপনি ভুল বুঝবেন কিনা।

ঈদের আগে আগে বাড়ি আসবো। আম্মাকে বলবেন যেন বড়মামার কাছ থেকে হাজার চারেক টাকা নিয়ে আমাকে পাঠায়। বাসায় রান্নার কিছুই কেনা হয় নি। বাইরে খাওয়ার খরচ বেশি। এবং অস্বাস্থ্যকর। আম্মার তদারকিতে দেয়া সম্পত্তির এতটুকুই তো মাত্র রিটার্ন। আপনার সেন্টিমেন্ট থাকা স্বাভাবিক, কারণ আপনার শ্বশুরবাড়ি। আমাদের কিসের সেন্টিমেন্ট। শিশু মংলায় পড়বে। বাবু ইশকুলে। আপনারা না চাইলেও এসব করা হবে। দোয়া করবেন।

শহিদুল্লাহ[১০]

রুদ্র ও তসলিমার দাম্পত্য জীবন বেশ সুখেই কাটছিলো। রুদ্রের উৎসাহ, প্রেরণা ও সহযোগিতায় তসলিমাও লেখালেখির জগতে পুরোমাত্রায় যুক্ত হয়ে পড়েন। কবি হিসেবে তসলিমার পরিচিতি ও জনপ্রিয়তাও হয়েছিল বেশ। আর এই কবি খ্যাতির পেছনে রুদ্রের যথেষ্ট অবদানকে তসলিমাও অস্বীকার করেন নি–

রুদ্রকে আমি আমার সতের বছর বয়স থেকে চিনি। সেই সতেরো বছর বয়স থেকে রুদ্র আমার সমস্ত চেতনা জুড়ে ছিল। আমাকে যে মানুষ অল্প অল্প করে জীবন চিনিয়েছে, জগৎ চিনিয়েছে– সে রুদ্র। আমাকে যে মানুষ একটি একটি অক্ষর জড় করে কবিতা শিখিয়েছে– সে রুদ্র।[১১]

কবি রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর বংশলতিকা